আমার দুর্গা

বাঙালির পুজোর সাতকাহন

কল্যাণকুমার নন্দী

পুনশ্চ

কাকভোরে ঘুম ভেঙে গেল। জানালায় চোখ যেতে দেখি, আলো ভালো করে ফোটেনি। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝমিয়ে। এমন বাদলদিনে এত সকালে ঘুম ভাঙার কথা নয়। তবুও ভাঙল। ঘুমকাতুরে বলেই ঘুমভাব চোখের কোণে লেগে নির্ঘুমের কেমন একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। মা ওঠার আগে ঘুম ভেঙে গেল। পালা-পার্বণের দিন এরকম আগেভাগে ঘুম ভেঙে যায়। আজ তো তেমন কোনো পুজো নেই। এ বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। পুজো সারাবছর লেগেই থাকে। তখন ঘুম আপনা-আপনি ভেঙে যায়। টের পাওয়া যায় বাড়িটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। শব্দেরা ভিড় জমাচ্ছে। তারপর কলকোলাহলে গোটা বাড়ি শব্দের দখলে চলে যায়। আজ কিছু নেই। মা তখনও ঘুমাচ্ছে। আর আমি জেগে। বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বাজ পড়ছে কড়কড় শব্দে।

মা-র পাশে আমি। উঠতে গেলে মা টের পাবে। সাতসকালে জুটবে বকা। তাই মটকা মেরে পড়ে থাকা। শুয়ে থেকে ঘুম কেন ভাঙল তার কারণ বোঝা গেল। স্বপ্ন। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়? কুমোর নৌকা বোঝাই করে প্রতিমা তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে নদী বেয়ে আসছে। এমন সময় ঝড় উঠে নৌকা উল্টে যায় আর কী! নৌকার টাল খাওয়া দেখে ঘুম ভাঙে। কিন্তু কুমোর, নৌকা-এসব এল কোত্থেকে? গত সপ্তাহে কুমোর এসে বলে গেছিল, আজকে আসবে। সে তো আসবে ঠেলা গাড়িতে জিনিস চাপিয়ে। নদী, নৌকায় নয়। তা হলে? মনের মেঘ কাটল। মনে পড়ল গত দুপুরের মধুর অতীত। গতকাল ছিল ছুটির দিন। এই দিনগুলিতে দুপুর কাটে দিদির সঙ্গে গল্পের লোভে। আমার বয়সে দিদি ছিল দেশ বাড়িতে পুব বাংলায়। রথের আগে কুমোর আসত নৌকা বোঝাই খড়, বাঁশ, কাঠ, সুতলি, মাটি নিয়ে নদী খাল পেরিয়ে। নৌকা ভিড়ত সীমানার প্রান্ত ঘেঁষে বয়ে যাওয়া খালের ঘাটে। এই গল্পই ছবি হয়ে ভোর রাতে চোখের সামনে ঝিলমিল করেছে।

আর শুয়ে থাকা যাচ্ছে না। উঠতে গিয়ে শুনি, 'এত সকালে তো ওঠোনা। উঠলে যখন, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসবে। এই বৃষ্টিতে স্কুল গিয়ে কাজ নেই। ভিজতে ভিজতে স্কুলে যাবে। গিয়ে শুনবে 'রেনি ডে'। ফিরবে ভিজে। তোমার আবার একটুতেই ঠান্ডা লেগে জ্বর আসে।' বুঝলাম পায়ের পাতা ডুবিয়ে স্কুলে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে না। জল ভাঙার সপাসপ আওয়াজ অধরাই থাকবে।

হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার ঘরে না গিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। মেঘের দল এমন তাণ্ডব পাকিয়েছে যে বিদ্যুতের চমকে, শব্দে জগত-সংসার কেঁপে উঠছে। আমাদের চারপাশে গাছ-গাছালির ঘন বসতি। বাজ পড়ে কত নারকেল গাছ যে মরে গেছে! এই দুর্যোগে দুঃসাহস দেখাতে কয়জনাই-বা বের হয়। বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির তোড় এলোপাথাড়ি নেচে বেড়াচ্ছে। বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে জেঠুদের মাঠ আর সবুজ নেই। জলে থই থই। নাগাড়ে বৃষ্টিতে ডানপাশের ডোবা পুকুর টুবুটুবু হয়ে উপছে পড়ে গড়িয়ে চলেছে ইচ্ছেমতো। এর মধ্যে দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা মাছ ধরতে নেমেছে প্রবল উৎসাহে। সকলের হ্যাফপ্যান্ট, খালি গা, মাথায় গামছা, হাতে বাঁশের খালুই, লাঠির ডগায় লোহার ছুঁচোলো শিক লাগানো টেটা। দিদি পিছন থেকে বলল, 'তালপাতার সিপাই চলেছে যুদ্ধে।' সত্যি সকলেরই আমার মতো পাতলা চেহারা। তবে দিদি যাই বলুক আমি জানি, এরা টেটার ঘায়ে মাছ গাঁথতে ওস্তাদ। নিখুঁত টিপ! আমার খুব ইচ্ছে করছিল, ওদের দলে যোগ দিই। মুখ চেনা, না করবে না দলে নিতে। কিন্তু বাড়ির কড়া শাসন উলটিয়ে ওই সকালে বেরোবার হিম্মত নেই। বাবা-মা কেন যে বুঝতে চায় না, গোড়ালি ডোবা জলে সপসপ শব্দে চলতে-ফিরতে কী মজা! দিদিকে বললেও চোখ গোল গোল করে শাসন করে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, কেন যে ওদের ঘরে জন্মালাম না।

ঘুম ভেঙেছে আধঘন্টা হবে হয়ত। বৃষ্টির বিরাম নেই। পুরো বাড়ি জাগতে আজ নির্ঘাত দেরি হবে। বিছানায় আয়েশ করার দিন। বাবা উঠেছেন বহুক্ষণ। এখন বাথরুমে। সাড়ে সাতটায় অফিসে বেরোবেন। মা ব্যস্ত রান্না ঘরে। এখনও নজর পড়েনি আমার দিকে। নইলে পড়তে না বসার জন্য নিশ্চিত কানমলা বরাদ্দ ছিল। আমি স্কুল যাব না। দিদি পড়ে কলেজে। সেও বলেছে যাবে না। বাগানের অনাবৃত মাটি জলে টইটুম্বুর। সেই জল বারান্দার সিঁড়ির প্রথম ধাপ ছুঁইছুঁই। পাঁচিলের ওপারে নর্দমা ভরে জল উপছে রাস্তায়। দিদি কাগজের নৌকা বানিয়ে দিচ্ছে। আমি পটাপট মাথা নীচু করে জলে ভাসিয়ে দিই। হাত দিয়ে জলের ঠেলায় নৌকা খানিক এগিয়ে জলের ঝাপটায় মুখ থুবড়ে ন্যাতা। বৃষ্টি ধরার নাম গন্ধ নেই। মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। দিদিকে জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, 'কুমোর কি আসতে পারবে এই ঝড় জলে?' দিদি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কমে যাবে। আকাশের ভাঁড়ারে জল কমে এসেছে।' আমি অবাক চোখে প্রকৃতির বিরামহীন স্নান দেখতে থাকি।

বাবা ভিন্ন বাড়ির কেউ বেরোয়নি। আমার তিন দিদি—দিদি, দিদিমণি, দিদিভাই। দুই দাদা—দাদা, মেজদা। সকলেই বাড়িতে। কেউ স্কুলে বা কলেজে যায়নি। ফলে বাড়িতে গমগমে পরিবেশ। কথা বইছে অনর্গল। পথও জনহীন। কুকুর বেড়াল গোরু ছাগলের দল কোনো-না-কোনো একটা নিরাপদ আশ্রয়ে। বনবাদাড়ে ঘোরা

কিছু ছেলে-পুলের বেহিসেবি দল মাছ ধরার আনন্দে দাপাদাপি করে চলেছে সকাল থেকে। আমরা সকলে বারান্দা ছেড়ে নড়ছি না। একটানা বৃষ্টি আর হওয়ার দমক শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। পাশের জলভরতি ডোবা থেকে ব্যাঙের দল গ্যাঙর গ্যাঙর ডাক ছাড়ছে। এমনিতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে ঝরতেই জেগে ওঠে।

দুপুরে খিচুড়ি, ডিমভাজা, বেগুনভাজা জম্পেস করে খেয়ে আবার বারান্দায়। দু-চোখ মেলে চলে কুমোরের আসার প্রতীক্ষা। খিচুড়ি খেলে ঘুম পায়। আজ সে সবের বালাই নেই। ঘুম আসার জো আছে! চোখের সামনে এমন ভিজে সবুজ সময় নিয়ে দেখার সুযোগ হয় কই? প্রকৃতি সর্ব্বস্ব ঢালছে ভূমি আঁচল পেতে নিয়ে চলেছে। মানবজীবনে বেঁচে থাকার সম্পদ। জল। এ ছাড়া মানুষ বাঁচে নাকি? এতে অন্যদের কত আনন্দ। গাছের দল, ব্যাঙের দল, মাছের দল কেউ হেসে ওলটপালট খাচ্ছে, কেউ গাইছে, কেউ বা বেপরোয়া হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। যেমন মাছের দল।

সকাল থেকে মা আমাদের কীর্তিকলাপ দেখে চলেছে। আজ কারোর বই-এর সঙ্গে সম্পর্ক হয়নি। এতে মা বেশ অসন্তুষ্ট। বারান্দায় এসে দাদাকে নিয়ে পেছনের বাগানে গেল। আমি পিছু পিছু যাই। ওখানে গোয়লে গোরু বাছুর বাঁধা আছে। জল উঠল কিনা তাই দেখতে যাওয়া। গোয়াল ঘরটি দাঁড়িয়ে আছে পাকা হলদে রঙের বাঁশের খুঁটির ওপর। টালির চাল, মাটির মেঝেতে দু-থাক ইট বসানো, দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। এক পাশে বাঁশের মাচায় খড়ের আঁটি বোঝাই। খইল, ভুসি আছে আলাদা বড়ো বড়ো ডিব্বায়। আমি জানি মা আর একটা জিনিস পরখ করতে এসেছে। আমাদের পিছনের বাগানে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল, বাতাবি, গাছগাছালিতে ভরা। শুনেছি, কোণা খামচিতে সাপও আছে। বাস্তু সাপ নাকি সকলের বাগানে থাকে। সেই সাপের গর্তে বর্ষার জল ঢুকে গেলে ওরা বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সেই আস্তানা গোয়াল ঘর। শুধুমাত্র অবলা জীব থাকে। হুট হ্যাট করবে না। লাঠি বাগিয়ে তেড়ে আসবে না। তবে এরা সুযোগ পেলে গোরুর ঠ্যাং পেঁচিয়ে বাটে মুখ দিয়ে দুধ টেনে নেয়। শোনা কথা। কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। মা সেটাও দেখে নিল। গোপালদা গোরুর ও বাগানের দেখভাল করে। সে গেছে দেশের বাড়ি। ফিরবে আগামীকাল। বৃষ্টি বাদলে এক-দু-দিন দেরিও হতে পারে।

মা আমাকে গোয়াল ঘরে দেখে বলল, 'তুমি এখানে কেন?' মা রেগে গেলে তুমি বলে।

'এমনি দেখতে এলাম তোমার পিছন পিছন।'

মা দাদাকে নিয়ে চলে যেতে যেতে চড়া সুরে বলল, 'গোয়াল ঘরে বেশিক্ষণ থেকো না। মশার কামড়ে আবার রোগ না বাঁধিয়ে বসো।'

সত্যি মশার বড্ড উৎপাত। মশারা কি গোরুর চোনা আর গোবরের গন্ধ ভালোবাসে? তবুও কেন জানি না, এই গোয়াল ঘরই আমার কাছে সবথেকে বিশ্বস্ত জায়গা বলে মনে হয়। গোপালদা দিনে এক-দু-বার ঘুঁটে পুড়িয়ে মশা তাড়ায়। দুধ দোয়াবার সময় মশা বিরক্ত করলে বড়ো অসুবিধা। দিনে একবার অন্তত এই ঘরে আমি ঢুকি। এখানে সব নিয়মে চলে। দৃশ্যের কোনো তফাৎ চোখে পড়ে না। সময় এখানে যেন থমকে থাকে। বয়স বাড়ে না। গোরু জাবর কাটছে তো কাটছেই। বিরাম নেই। ল্যাজ নাড়িয়ে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। মশা কাউকে ছাড় দেয় না। কাক প্রায়শই ঢুকে পড়ে গোরুর পিঠে চেপে বসে। কী যে আনন্দ পায় কে জানে? তবে গোরু এতে বিরক্ত হয়। আমি গুলতি তাক করে মারার চেষ্টা করেছি। পারিনি। উলটে আমি গোয়াল ঘরে ঢুকতে গেলে কাক উড়ে এসে ঠোকরাতে আসে। গোপালদা না থাকলে হয়ত একদিন ঠুকরে দিত। আর গুলতি নিয়ে বীরপুরুষ সাজিনি। দুধ দোয়াবার সময় প্রায়শই গোয়াল ঘরে আসি। তেলতেলা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়াই। গোপালদা খুঁটিতে হাত মুছে তেলতেলা করেছে। আমি দেখেছি, আগে বাছুরকে দুধ খেতে দেয়। তারপর কেমন একটা অদ্ভুত ঢঙে হাঁটু ভাজ করে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে দুই হাঁটুর মাঝে পিতলের বালতি বসায়। পায়ের গোড়ালি মেঝে থেকে একটু ওপরে থাকে। গোপালদা আমাকে বলেছে, বাছুরকে খেতে না দিয়ে দুধ দোয়াতে গেলে বাঁটে দুধ আসবে না। যতক্ষণ বাছুর বাঁটে মুখ না দেবে, দুধ বেরোবে না। আঙুল ছুঁয়ে দেখেছি, সদ্য দোয়ানো দুধ হালকা গরম। গোপালদা শিখিয়েছে দুধ দোয়ানোর সময় গোরুকে আদর করলে দুধ বেশি দেয়। আমি সেইমতো ধবধপে সাদা গোরুর পিঠে গলায় হাত বোলাই। গলার চাদরে হাত রাখলে গোরুর চোখ বন্ধ হয়ে আসে। বুঝি ওর ভালো লাগছে। ছোট্ট সাদা বাছুরটাকে মাঝেমধ্যেই জড়িয়ে ধরি। গোপালদা দুধের বালতি নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলে কিছুক্ষণ থেকে যাই। বাগানের হরেক পাখির ডাক আসে ওই ঘরে। ঘুঘু ময়না, টিয়া, বুলবুলি, ফিঙে এ-ডালে সে-ডালে নেচে বেড়ায়। টিয়া কদাচিৎ এসে বসে ওই পেয়ারা গাছে। পেয়ারা ওদের খুব প্রিয় ফল। তবে গোয়ালঘরের ভিতর বেশিসময় থাকা যায় না। বড্ড ঝাঁঝ। নাক জ্বালা করে। এখানেই একমাত্র সূর্যের আলো বেড়ার ফাঁক গলে ভিতরে তৈরি করে ঝিলমিল। যেদিন হাওয়া থাকে ঝিলমিলের নাচন শুরু হয়। আমার মতো গোরুও তাকিয়ে থাকে সেদিকে। চোখ কাঁপে। আমি আমার মতো করে বুঝি, গোরুর অনুভূতি মানুষের মতোই। নিজস্ব কোনো কিছু লুকোবার থাকলে গোয়াল ঘরই বিশ্বস্ত জায়গা। খড়ের আঁটি নামাতে গিয়ে গোপালদা পেয়েছে মার্বেল ভরতি ছোটো কৌটো, বাসের টিকিটের

বান্ডিল, গুলতি, ভাঙা কড়াই-এর টুকরো, কাঁচের টুকরো। আমার জেঠতুতো, খুড়তুতো সমবয়সি ভাই বোন অনেক। প্রত্যেকের কিছু না কিছু নিজস্ব জিনিস থাকে। কেউ কাউকে দেখালেও হাতে দিতে চায় না। দিলে যদি ফেরত না পায়। সেই গোপন আস্তানায় এরপর থেকে যাই রাখি না কেন গোপালদাকে আগে বলে নিই।

ঘুম আঠার মতো লেগে আসতে গোয়ালঘর থেকে ফিরলাম। বিছানায় ঘুমের ঘোরে শুনলাম দিদি বলে চলেছে, 'ভাই ওঠ, কুমোর এসেছে।' মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে লাফ দিয়ে সোজা বারান্দায়। সত্যি একটা ঠেলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। যার আপাদমস্তক ত্রিপলে ঢাকা। বারান্দায় কুমোর ও তার শাগরেদ কাক-ভেজা হয়ে কাঁপছে। বৃষ্টি তখন ধরেছে। মা ওদের গামছা, ধুতি, জামা হাতে তুলে দেয়। ওদের চোখ মুখ বলছে, পেটে আগুন খিদে। মা বলল, 'গা-মাথা মুছে কাপড় পালটে এসে বসো। কিছু খেতে হবে।' ঠেলাওয়ালা সমেতো ওরা দু-জন থালা ভরতি খিচুরি গপগপিয়ে খেতে লাগল।

মা বলল, 'আজ এই বৃষ্টির মধ্যে না এলেই ভালো হত।'

কুমোর খেতে খেতে উত্তর দিল, 'গতকাল ঠেলায় সব চাপানো হয়। আজ না এলে একদিনের বাড়তি ভাড়া গুণতে হত। ঠেলা নিয়ে ও এখন চলে যাবে।'

খাওয়া শেষে তিনজন ধরাধরি করে সব জিনিস তুলে বারান্দায় রাখল। বড়ো বারান্দা হলেও তিনটে দরজা আগামী কয়েক মাসের জন্য পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হল। সকলকে একটা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে বেরোতে হবে। এখানেই প্রতিমা তিল তিল করে গড়ে উঠবে। প্রতিদিনের সাক্ষী থাকব আমি। দিদি বলল উদাস চোখে, 'তোর বয়সে প্রতিমা গড়া দেখেছি দেশ বাড়ির দুর্গামণ্ডপে। তুই দেখবি খোলা বারান্দায়।'

গতকালের বর্ষণের কোনো চিহ্ন আর পড়ে নাই। মাঠ-ঘাটের জল নেমে গেছে। ঘন নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড স্বাধীন মেঘের দম্ভ। পরশু রথ। এই দু-দিনে কুমোরকে বাঁশ কাঠ দিয়ে কাঠামো বানাতে হবে।

দুই

আজ রথ। তাক থেকে কাগজে মোড়া রথ নামানো হয়েছে। রথ সাজবে বাগানের পাতাবাহার গাছের ডাল দিয়ে। পুরানো নিশান পালটে নতুন দেখনদারি নিশান লাগাবার ভারও গোপালদার ওপর। তবে জানি এখন এসব কিছু হবে না। আর জানি, মা বলেছে, 'আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব। ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম, পুরাণ বইতে রথের কথা আছে।' দিদি আবার শ্লোক সমেতো শুনিয়েছে 'রথের রশি টানতে পারলে পুনর্জন্মের কষ্ট ভোগ করতে হবে না ; 'পুনর্জন্মন